লেখক বার্গম্যান

পূর্ণেন্দু পত্রী

বার্গম্যান আর ছবি করবেন না। দুটি-একটি নির্ধারিত ছবির কাজ শেষ হলেই, এই প্রিয় মাধ্যম থেকে চিরবিদায়। যারা তাঁকে ভালোবাসেন, তাঁর প্রতিভার নিয়ত উন্মীলনের দিকে তাকিয়ে যারা শ্রদ্ধায় আনত, তাঁর ছবির পরিদৃশ্যমান অন্ধকারের আপাত নৈরাশ্য ভেদ করে যারা পেয়ে যান চৈতন্যকে সজীব করে তোলার পক্ষে উপযুক্ত অজস্র আলোকিত বীজ অথবা শস্য, তাদের কাছে এ-এক মর্মান্তিক শোক সংবাদ যেন। বার্গম্যানকে আমরা চোখে দেখিনি। কখনো ভারতবর্ষের মাটিতে পা পড়েনি তাঁর। কিন্তু সেই যেদিন আমাদের সঙ্গে 'সেভেন্থ সীল' ছবির মারফৎ প্রথম পরিচয়, তারপর থেকেই আমাদের অন্তরঙ্গ আত্মীয় এবং অভিভাবকের সংক্ষিপ্ত তালিকায় তাঁর নামই সবার উপরে। একথা আদৌ সত্য নয় যে, তিনি যে-ভাষায় কথা বলেন, তা আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝে গিয়ে উল্লসিত হয়ে উঠি উচ্ছ্বাসে। বরং ঘটে এর বিপরীতটাই। তাঁর যে-কোনো ছবিই আমাদের স্বাভাবিক আবেগপ্রবণ প্রত্যাশাকে নিভিয়ে দেয় এক ফুঁ-এ। জীবন সম্পর্কে তৃপ্তিদায়ক নানা ধ্যান-ধারণায় ফোলা বেলুনের মতো পুষ্ট হয়ে আমরা তাঁর ছবির সামনে গিয়ে বসি। আর ছবি যখন শেষ হয়, নীরবে নিরুচ্ছ্বাস মন্তব্যে, মাথা নুইয়ে, যেন বিশাল সব প্রশ্নের পাথর ঘাড়ে নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে এখন এমনি বিপন্নতায়, ভারাক্রান্ত চেতনাকে টানতে টানতে আলোকিত পৃথিবীর অন্ধকারে এসে দাঁড়াই। পরে মনে হয়, আমরা ফিরে আসছি কোনো প্রার্থনা সভা থেকে। তাই কি? না বোধ হয়। আমরা ফিরে আসছি এমন এক সানাটোরিয়াম থেকে, যেখানে আমরাই শুয়ে আছি মৃত্যুশয্যার সাদা চাদরে। বার্গম্যান শুধু ভালোবেসে খুলে দিয়েছিলেন দরজাটা, যাতে দূর থেকে নয়, ঘনিষ্ঠ নিকট থেকে আমরা দেখে নিতে পারি আমাদের, তুমুল কান্না এবং ভয়াবহ গোপন সব ফিসফাস-সহ। ছবি করা ছেড়ে দিয়ে কি করবেন তিনি, জানিয়ে দিয়েছেন তাও। নিমগ্ন হবেন পাঠে। এতকাল ধরে জমেছে যে-সব বই, যা পড়া হয়নি সময়ের অনটনে, অথবা স্বেচ্ছাকৃত বৈরাগ্যে

সরিয়ে রেখেছিলেন যাদের, সেই-সব অবশ্যপাঠ্যের দিকে ঝুঁকে পড়বেন তখন। তাহলে কি ঘটনাটা দাঁড়াবে এইরকম যে, এতকাল যিনি সমগ্র মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে এসেছেন নিজের জিজ্ঞাসা-জর্জর শিল্পে, এখন তিনি নিজেকেই সমৃদ্ধ করতে চাইছেন নিজের ব্যক্তিগত সুপরিসর অভিজ্ঞতার বাইরের জ্ঞানে। বোঝা যায়, নিজেকে পরিশ্রান্ত মনে করছেন তিনি। এই ক্লান্তির কথা জানিয়েছিলেন এক দশক আগেও একবার। তখন 'ফারো ডকুমেন্ট' করছেন। নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে কিনেছেন একটা এ্যারিফ্লেকস ক্যামেরা আর নাগ্রা টেপ-রেকর্ডার। তাঁর তখনকার মনের কথা — হ্যাঁ আমি নিজেই হাত লাগাতে চাইছি। নিজেকে তৈরি করে শিখতে চাইছি এই সব যন্ত্রের উপরে কর্তৃত্ব। তখন আমিই হয়ে যাবো আমার চোখ, আমার হাত, আমার কান। এটা তো সত্যিই যে, সেভন্‌কে (প্রিয় ক্যামেরাম্যান সেভন্ নিকোভিস্ট) সব সময় হাতের কাছে পাওয়া কঠিন।

'কাজের সঙ্গে এই যে উন্মাদনাময় সম্পর্ক, সমস্ত সময় কাজে এঁটে লেগে থাকা, এর থেকে সরে আসতে চাইছি আমি। এখন শুধু সেইটুকুই করতে চাই, যা আমার পছন্দ, যাতে মনের সাড়া। তার বেশি কিছু নয়। এ্যারিফ্লেকস আর নাগ্রাটাকে নিয়ে কাজের হাতেখড়িটা বেশ উত্তেজনাময়ই হয়ে উঠবে আমার পক্ষে। এর আগে এ-সব করার অবসর পাইনি। ইচ্ছে আছে, এই নিয়েই লেগে থাকবো। কি ঘটবে, কি ফলবে, কোনো ধারণা নেই। দেখাই যাক।'

ঐ ৬৯-এ চেয়েছিলেন ফীচার ছেড়ে দিয়ে নিজের হাতে ডকুমেন্টারিই করে যাবেন কেবল। তা করতে পারেননি। ফীচার করতে হয়েছে, করেছেনও অনেক, 'ফারো ডকুমেন্ট'-এর পর। এবারেও কি সত্যি পারবেন? পারবেন হয়তো। জীবনের শেষ বেলায় এসে পাওয়া ছবিকে, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'শেষ বয়সের প্রিয়া'। বার্গম্যান, যিনি জানিয়েছেন মঞ্চ তাঁর 'ওয়াইফ', আর সিনেমা 'মিসট্রেস', আর কিছুদিন পরেই তাহলে জীবনযাপন করবেন ভিন্ন এক রমণীর সঙ্গে, তাঁর কোলাহলহীন কার্যোন্মাদনাহীন জীবনে যে হয়ে উঠবে নির্ভরশীল বিদুষী বান্ধবী। তাঁর বেলায় শেষ বয়সের 'প্রিয়া' হয়ে উঠবে অধ্যয়ন। এখানেও প্রশ্ন অথবা প্রত্যাশা থেমে থাকে না। এমনও তো হতে পারে, এখন থেকেই অগ্রিম কল্পনা করে নিতে পারি আমরা, ক্যামেরা-ছুট হাতে কোনো একদিন কলম তুলে নেবেন তিনি। অথবা আগে যে কলমে লিখতেন শুধু চিত্রনাট্য, সেই কলমেই জন্ম নেবে গল্প, উপন্যাস, নাটক অথবা আত্মচরিত অথবা ভিন্ন স্বাদের কোনো দার্শনিক রচনা। হয়তো অধ্যয়নের তাপ অথবা চাপই তাঁকে ঠেলে দেবে এই নতুন সৃজনে। তখনো তাঁকে পাওয়া ফুরোবে না আমাদের।

কিন্তু লিখতে এবং বলতে, দুটোতেই ভীত-সন্ত্রস্ত তিনি। এই প্রসঙ্গে ১৯৭১-এ

চার্লস টমাস স্যামুয়েলস-এর নেওয়া একটা ইন্টারভিউ-র কিছু অংশের দিকে ঘুরে তাকাবো এখন।

মি. বার্গম্যান, খুব সাদাসিধে একটা প্রশ্ন দিয়েই শুরু করা যাক। আমাকে যদি কোনো কারণ দেখিয়ে প্রমাণ করে বলা হতো অন্যান্য চিত্রপরিচালকদের থেকে আপনার অগ্রগণ্যতা কোথায়, আমি দেখাতাম আপনার তৈরি স্বতন্ত্র জগৎটাকে, অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের বিরাট স্রষ্টাদের কাজে যা আমরা দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু ফিল্মে কদাচিৎ, আর সেটাও আপনার মানের কাছাকাছি নয়। আসলে আপনি অনেকটাই লেখকদের মতো। তাহলে হলেন না কেন? এই প্রশ্নের সূত্রেই বার্গম্যানের উত্তর — যখন নিতান্তই বালক, তখন থেকেই আমি ভুগছি শব্দের দৈন্যে। আমার লেখাপড়াটা ছিল বেশ ধরাবাঁধা। বাবা ছিলেন যাজক, তার ফলে আমি থাকতাম আমার নিজস্ব স্বপ্নের গোপন জগতে। আমি খেলা করতাম আমার পুতুল-থিয়েটারের সঙ্গে।

বাস্তবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অথবা সম্পর্ক তৈরির উপায়ও ছিল আমার।

আমি ভয় করতাম বাবাকে, মা-কে, বড়দাদাকে, সবকিছুকেই। পুতুল-থিয়েটার নিয়ে খেলা আর আমার ছোট্ট-সিনেমা প্রোজেকটর, এই দুটোই ছিল আমার আত্মপ্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। বাস্তব আর উপন্যাস এই দুটোকে এমন গুলিয়ে ফেলতাম যে, বাড়ির লোকেরা আমাকে বলতো মিথ্যুক। বড়ো হয়েও এক দুরবস্থা। অন্যকে কিছু বলা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব...। যখন জীবনের আঠারোটা গ্রীষ্ম পার, মনে পড়ছে, সেই সময়ে, সদ্য স্কুলের পড়া শেষ করেই, হঠাৎ লিখে ফেলেছিলাম একটা উপন্যাস। এবং স্কুলে যখন রচনা লিখতে হতো, খুব ভালো লাগতো আমার। কিন্তু লেখাকে কখনো আত্মপ্রকাশের মাধ্যম মনে হয়নি আমার। নভেলটাকে তাই ডেস্‌কের মধ্যেই ফেলে রেখেছিলাম, আর ভুলেও গিয়েছিলাম সেটার কথা। হঠাৎ, ১৯৪০-এর গ্রীষ্মে লিখতে শুরু করি এবং লিখে ফেলি বারোটা।

— নাটক ?

— হ্যাঁ। সেটা ছিল একটা আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের মতো।

— এর থেকে একটা 'হাইপোথেসিস' পেয়ে যাচ্ছি। লেখক হিসেবে আপনার ক্ষমতা, আর শব্দের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার আগ্রহ, এ দুটোই আপনি মেলাতে পারছেন, পূর্ণতা পেয়ে যাচ্ছে আপনার নাটকে এবং সিনেমায়। এই দুটো মাধ্যমে প্রাণ পায় একসঙ্গে ভাষা এবং তিনি জেনে নিতে পারেন সে সম্পর্কে দর্শকের প্রতিক্রিয়া।

— কিন্তু আমার আরম্ভ ছিল উল্টোরকম। কারণ যখন লেখা আরম্ভ করি, শব্দ সম্বন্ধে ভীষণ সন্দিগ্ধ ছিলাম আমি। আর কিছুতেই খুঁজে পেতাম না ঠিক শব্দ, ঠিক মতো শব্দ বাছাইয়ের সমস্যাটা আমার চিরকালের।

অথচ, হিসাবের খাতা ঘাঁটলে দেখতে পাই, সারা জীবনে মোট যা ছবি করেছেন, নাটকের প্রসঙ্গ বাদই দেওয়া যাক এখানে, তার আশি ভাগ চিত্রনাট্য তাঁরই নিজের কলমে লেখা। এবং কখনো কখনো আট-দশ দিনেই। আর আমরা কে না জানি বার্গম্যানের সংলাপ একই সঙ্গে মুখের কথা এবং বুকের কবিতা। সুতরাং পাঠক বার্গম্যান কোনও একদিন লেখকরূপে আবার ফিরে আসবেন আমাদের উন্মুখ প্রত্যাশার কাছে, এমন সুস্থির আশার কলমে আপাতত ঢেকে নিতে পারি তাঁকে না পাওয়ার ক্ষতচিহ্ন।

সৌজন্যে : পূর্ণেন্দু পত্রীর 'সিনেমা সংক্রান্ত' গ্রন্থ